কালিবাড়ি

চিরঞ্জয় দাস

চাঙালী কালিবাড়ির কালি জাগ্রত দেবী। রামগড়ের এমন মানুষ খুব কমই রয়েছে যে না সেখানে মানত করেছে। বিশ্বেশ্বরপুরের বুক চিরে চলেগেছে রূপনারায়ণ। রূপনারায়নের তীর ঘেঁষে বুড়োশিবতলা মাঠের এক প্রান্তে ছেলেরা ফুটবল খেলে। আর অন্যপ্রান্তে চাঙালী কালীবাড়ি। এটা একটা পীঠস্থান। কালিপুজোর দিন বছর কয়েক আগেও পাঁঠা বলি হতো। ইদানিং আর হয় না। তবে তারও একটা কাহিনী আছে। রামগড়ের মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। দেবপ্রসাদ চাঙালী কালিবাড়ির পুরোহিত ছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশ একবেলা নিজে হাতে রেঁধে খেতেন। অন্যবেলা উপবাস, বিণস্ত্রীক, স্ত্রী মন্দিরা দেবী বিবাহের বছর খানেকের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। সেই থেকে তিনি নারীসঙ্গ বর্জন করেছিলেন। যদিও লোকে বলত ঠিক উল্টো কথা! তাঁর ঘরে নাকি একাধিক বার নারীর কথোপকথনের শব্দ পাওয়া গেছে! যাই হোক। একবার কালিপুজোর অমাবস্যার দিনে নন্দন মিত্তিরের বিধবা ছোট মেয়েটিকে পুকুরে স্নানরতা দেখে গেলেন তিনি। বিনতার শরীরে যেন ভরা বাদরের বান ডেকেছে। প্রকৃতির লীলা খেলা, যাকে দেখার কেউ নেই তার রূপ যেন ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। দেবপ্রসাদের মুগ্ধ দুই চোখ। সেই উপচে পড়া রূপকে সম্মান জানাতে সে মোহিত দুচোখের দরকার হয় ঠিক সেইরকম দুটো চোখ!

পুকুর পাড় তখন ফাঁকা। জনমনিষ্যি নেই। এই দুজন ছাড়া। গেরস্থবাড়িতে তখন অলক্ষ্মী বিদায়ের পুজো হচ্ছে। কাঁসরের শব্দ শান বাঁধানো পুকুর পাড়ে অভাগা অলক্ষ্মীর দুর্দশা দেখে যেন মাথা খুঁড়ছে। বিনতার অনাবৃত পীঠে, সিক্ত বসনে তখন প্রথম শীতের দুষ্টু রোদ যেন মশরধারে আটকে রয়েছে। দেবপ্রসাদ চমৎকৃত হলেন! সারাজীবন তিনি বিস্র স্তা, রক্ত চক্ষু, প্রমও, ভয়ানক সেই কালো মেয়ের যুদ্ধং দেহি রূপ দেখেছেন। স্বামীর বুকে পা দিয়ে যে লজ্জায় জিভ কেটে ফেলেছে। আর আজ দেখছেন যেন নারীর আর এক রূপ, যে রূপ, যে নারী যুগে যুগে হয়েছে কত না পুরুষের ধ্বংস বা পতনের কারণ। কত জমিদারী, কত রাজ্য, কত সাম্রাজ্য স্থাপনের গোপন ইতিহাসের পুরোনো হয়তো বা ক্ষয়ে যাওয়া হলুদ পাতার অন্তরালে, কোনো সুপ্রাচীন প্রাসাদের ধুলো পড়া জলসাঘরের তৈলচিত্রের গায়ে অথবা ঝাপ্সা ঝাড়লণ্ঠনের শরীরে সমস্ত বর্ধিত মাকড়সার জালের নৈঃশব্দে আজও শুনতে পাওয়া যায় কোনো সুন্দরীর নুপুরের নিক্কন! এই সৌন্দর্যের ভুলভুলাইয়াতে পড়ে কত রাষ্ট্র নায়ক, কত রাষ্ট্র ভুলুণ্ঠিত হয়েছে, ইতিহাসের পুঁথি হয়তো বা তার সন্ধানও রাখতে পারে নি! বেদপ্রসাদ সেদিন দুপুরে পুজোর নামে বিনতাকে নিজের ঘরে ডেকে আনলেন। এরপর কি হয়েছিলো অনুমান করা যায়। সেদিন দুপুরেই বিনতার মৃতদেহ পাওয়া যায় পুকুরপাড়ে। সে আত্মহত্যা করেছিলো।

চাঙালী কালি জাগ্রত দেবী, বহু মৃতপ্রায় মানুষকে তাঁর চরনামৃত প্রাণ ফিরে দিয়েছে। এসব কথা লোকগাথা নয়। নিভের্জাল সত্যি কথা। বুড়োশিবতলার মাঠের প্রান্তে এই সুপ্রাচীন বটগাছটিতে যে এতো এতো কাপড় বাঁধা রয়েছে। এসব দুরান্তরের লোকজনের। এই বটে নিজের মনস্কামনা জানিয়ে কাপড় বাঁধলে তা পুর্ণ হয়।

মৃন্ময়ী আজ বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে! কখনো তার ভাতের মাড় উপচে পড়ছে। তো কখনো ভাজা পোড়া লেগে যাচ্ছে। এদিকে বাড়ির পাশ ঘেঁষে বয়স্ক অশ্বত্থ গাছটার পুর্বদিকের ডালটাতে বসে অসময়ের কোকিলটা সুর করে ডেকে চলেছে। মৃন্ময়ীর এই বন্ধুটি জুটেছে মাস খানেক হলো। তার নিসঙ্গ জীবনে বন্ধু বলতে সংসারের কাজ আর সে নিজে। স্বামীর ফিরতে রাত হয়। দুটো কথা বলবার লোকের তার ভারি অভাব। তার সে বলতে হালদার বাড়ির ছোট বউ। তাও সে মা হবে বলে এখন এ বাড়ি খুব একটা আসতে পারে না। আর পাড়াতে কেউ তার সাথে কথা বলে না। আজ স্নান করে আসার পর উঠোনের তুলসীতলায় জল দিতে গিয়ে ঘটিটা হাত ফস্কে পড়ে যায়। ঠিক তখনই হারাধন সাইকেল নিয়ে কাছারিতে বেরোচ্ছে। তখন থেকে মনটা তার কু ডাকছে। বারে বারে সে ইষ্টদেবতাকে সে জপ করছে যাতে হারাধন ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে আসে।

ভাতের মাড় ফেলতে ফেলতে সুধারানীর গলা কানে এলো তার। মাথায় ঘোমটা টেনে সে উঠোনে নেমে এলো, নিকোনো ওঠোন। আগে সেখানে সদর দরজাটা ছিলো এখন সেখানে পাঁচিলটা আধাআধি উঠে গেছে, দুটো অংশের দুটো দরজা, বাড়ি থেকে বেরোলে আকন্দ, বনতুলসীর ঝোপের মধ্যে একটা সরু পথ হাটপারে গিয়ে মিশেছে, হাট পেরোলে রূপ নারায়নের ঘাট।

সুধারানী নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন, গলাটা একদম নামিয়ে বললেন, কি রাঁধলি রে ছোট?

- ভাত, ডাল, তরকারি ...

- হ্যাঁ! ভাত, ডাল, তরকারি, দেখি, বলে তিনি দালানের ওপর রান্না ঘরে মুখ বাড়ালেন, ভাত নামালো বটে তবে পোড়া লাগা ডাল ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি উঠোনে নেমে এলেন।

- আজ কাল আমাকেও মিছে কথা বলছিস ছোট।

- মিছে কি দিদি। এই তো তরকারি বসাবো।

- থাম্, বলে ধমক দিলেন সুধারানী, কপটরাগে স্নেহ ঝরে পড়লো।

তিনি আঁচলের ভেতর থেকে একটি বাটি বের করলেন। সেটি মৃন্ময়ীর হাতে ধরিয়ে দিলেন, তাতে রয়েছে বেগুনের ঝাল আর শাকের তরকারি।

- এসবের কি দরকার ছিলো দিদি?

সুধারানী কটাক্ষ করলেন, মৃন্ময়ী মুখ নামিয়ে নিলো, আর কিছু বলার সাহস তার নেই!

- এখন আমি, উনি স্নানে গেছেন, এসে পড়বেন। বলেন সুধারানী বেরিয়ে গেলেন।

বিশ্বেরপুরের রেলস্টেশনটা এই সময় নিশ্চুপ থাকে, কিছু আগেই একটা ডাউন ট্রেন চলে গেছে। তখন স্টেশনে কিছু ব্যস্ততা বাড়ে। দুটো মানুষের আনাগোনা হয়। বাইরে দুটো একটা রিক্শার শব্দ শোনা যায়। তারপর আবার সব শুনশান হয়ে যায়। বিশ্বেশ্বরপুরের এই স্টেশনটা ছবির মতো সুন্দর। লোহার গ্রিল পেরিয়ে ওপারে রূপনারায়ণ উঁকি মারে। ছোট্ট প্ল্যাটফর্মের একধারে টিকিট ঘর, গুমটিঘর, পানীয় জল, আর দুটো একটা ফাঁকা বেধিও। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রূপনারায়ণের দিকে পিঠ করে দুপা এগোলে রিক্সা স্ট্যাণ্ড পৌছেনো যায়। এখান থেকে রিক্সা বিশ্বেশ্বরপুরের বিভিন্ন জায়গায় যায়।

বাইরের সাইনবোর্ডের সাথে সথে পসার কিছুটা ঝাপসা হয়েছে ভূপেন ডাক্তারের। বয়স সত্তরের ওপারে। সেই সাদা শার্ট আর হাঁটুর ওপর তোলা ধুতি। একসময় এই চত্তরের একনম্বর ডাক্তার ছিলেন। বিশ্বেশ্বরপুরের সবাই একনামে চিনতো, এখন বয়স হয়েছে। অতো ধকল নিতে পারেন না। তবে চেম্বারে বসেন রোজ, টুকটাক রোগী আসে, পয়সার জন্য নয়, চিকিৎসা করেন একটা নেশায়, এই চেম্বারটায় বেশ একটা আড্ডাও জমে ওঠে। স্টেশনমাস্টার দুলাল বাবু আসেন, যাত্রাপাড়ার সুবোধ বাঁড়ুজ্যে, কুমার সাহেব, অসীমবাবু। আর রয়েছেন হরিহর বাবু।

অদুরে রূপনারায়ণের ওপর ব্রিজটা চোখে পড়ে, কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, শীতের একটা স্পর্শ আছে হাওয়ায়, একটা বিবাগী আমেজ, মন উদাস করা একটা বিধুর হাওয়া ঝরপাতাগুলোকে নিয়ে নিজের মনেই খেলা করছে। বিশ্বেশ্বরপুরের স্টেশন ছেড়ে রূপনারায়ন পেরিয়ে ট্রেন চলে যায় রামগড়ের দিকে।

চেম্বারের সিঁড়িটাতে সামনের দেবদারু গাছটার একরাশ পাতা ডাঁই হয়ে জমে রয়েছে।

-রক্ত চাপ কিছুটা বেড়েছে হরিহর। মুখ তুললেন ভূপেন ডাক্তার।

- তাই, খুব বেশী নাকি?

- না, তবু একটু সাবধানে থাকা ভালো, এবার একটু চিন্তাভাবনা করা ছাড়ো হরিহর, সারাজীবন তো এই করলে।

একটু চুপ করলেন হরিহর, বললেন - নাহ! আমার আবার চিন্তা কিসের?

সৃষ্টিসন্ধান

- বয়স হচ্ছে তো, এখন কি আর অতো ধকল সয়।

একটু হাসলেন হরিহর। ষাটের মাঝামাঝি বয়স। মাথার বেশীর ভাগই প্রায় টাঁক হয়ে গেছে। ধুতি আর গায়ে একটি তুশের চাদর জড়ানো, গত বিশ বছর ধরে চাঙালী কালিবাড়িতে পুজো করে আসছেন। সাত্ত্বিক ব্রাক্ষণ মানুষ। বয়সের দরুন মুখে একরকমের কাঠিন্য এসেছে। চিরদিন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আপদে বিপদে যে কোনো সময়ে হরিহর সর্বক্ষণ মানুষের বড় ভরসা, তবে তাঁর নিজের ঘরে যে এইরকম বিপর্যয় ঘটবে কে জানতো? এই বয়সেও এখনও দুহাতে মানুষকে সাহায্য করেন। কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছেনা, কার চিকিৎসার সামর্থ্য নেই, কার শিশুকে পড়াবার সামর্থ্য নেই - সব কিছুতেই সবার আগে হরিহর ছুটে যান, সংসারে তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে, এক মেয়ে ঈশ্বরী। আর এক মেয়ে চাঙালী কালিবাড়ির জাগ্রত সেই কালো মেয়েটি।

কালিন্দীর মা মারা যায় তার জন্মের সাথে সাথেই, এরপর সে পিসীর কাছে মানুষ। বাপটা তার অমানুষ। প্রবল ভাবে মাদকাসক্ত, কালিন্দীর পিসী বানী সাতদিনের প্রবল জ্বরে প্রান হারায়। তখন তার বয়স দশ বছর। পানাসক্ত ঠিকই তবে একমাত্র মেয়ের প্রতি ব্রজকিশোর স্নেহে অন্ধ ছিলেন, একসময় বড় ঘরের মানুষ মানসিক এবং সাংসারিক ঘাত প্রতিঘাতের কলে তার এই অবস্থা। জীবনের দুঃখগুলো ভুলতে সুরারসকেই বেছে নিয়েছিলেন, বছর আটেক পিতার মৃত্যুর পর কালিন্দী একদিন আবিষ্কার করে যে আঠারো বছর বয়সে সে সম্পূর্ণ একা।

রাজমহলের পরের গ্রাম বিশ্বেশ্বরপুর। রূপনারায়ণের ধারে কাছারী থেকে ফিরতে সেদিন বেশ রাত হেয়েছে হারাধনের। প্রবল বর্ষার রাত, রূপনারায়ণের শরীর জুড়ে যেন রূপের বান ডেকেছে। কাছারী সংলগ্ন দুটো তিনটে ঘর। তারপর হাট খোলার মাঠ পেরিয়ে রূপনারায়ণের পার। এই দিকটা আলো খুবই কম। মাঠ পেরোতে গিয়ে হারাধন দেখলো অদূরে একটা শাড়ি পড়ে আছে। কৌতুহলবশত: এগোতে সে দেখতে পেল যে এক নারী অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে, তার শরীরে আঘাতের দাগ। খুব সন্তর্পনে সেই মেয়েটিকে কাছারীঘরে নিয়ে এলো হারাধন। দুটো বেঞ্চি জুড়ে, পুরোনো কিছু কাপড় বিছিয়ে তার ওপর শুইয়ে দিলো মেয়েটিকে, হারিকেনের তাপ দিয়ে সারা রাত শুশ্রষার পর উষালগ্নে সেই মেয়ের জ্ঞান ফিরলো, হারাধনকে দেখে, সব কিছু সোনার পর, মেয়েটি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। কথায় কথায়, বহুবার প্রশ্ন করায় জানা গেলো সেই মেয়েটির নাম কালিন্দী।

সেদিন রাতের, সেই শুশ্রূষার কথা কেউ জানলো না, শুধু রাজমহলের আকাশ বাতাস সাক্ষী রইলো এক পুরুষ ও নারীর একত্রে নিশিযাপনের কাহিনীর।

সুধারানী এবং হরিহর দুজনেই কালিন্দীকে আশ্রয় দিলেন, তবে কালিন্দীর পূর্বজীবনের কথা কিছুই জানা গেলো না। শুধু এটুকু বোঝা গেল যে মেয়েটি দু:খী। কালিন্দীর বিশাল দুটো চোখে একরাশ দুঃখ যেন দিনের দিনে কালির ছাপ ফেলতে লাগলো, এদিকে হরিহর ও সুধারানীর স্নেহ পেয়ে কালিন্দী যেন এই সংসারে একজন হয়ে উঠেছিল, মাস কয়েক পর একদিন সকালে হরিহারের বাড়িতে বেশ কিছু লোক জড়ো হলো। এদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলো যারা সেইদিন রাতে হারাধনকে একটি মেয়েকে নিয়ে কাছারী ঘরে ঢুকতে দেখেছিলো। মনুষ্যহীন বর্ষার রাতে আবদ্ধ গৃহে এক পুরুষ ও এক নারী, এরপর দুয়ে দুয়ে চার হয়েছে।

কালিন্দীর পিতার মৃত্যুর পর কোনো প্রতিবেশী থেকে সাহায্যের হাত এগিয়ে এলো না, এদিকে তখন বসন্তের তরুর মতোই শরীর জুড়ে ফুল ধরেছে, এবং মৌমাছিদের আনাগোনাও বেড়েছে তার চারদিকে। একদিন রাতের বেপাড়ার কজন তার গৃহে প্রবেশ করে। অবশ্য এরা তাকে সাহায্য করতে আসে নি! তরিৎগতিতে কোনোভাবে সে পালিয়ে যায়। আমাবস্যার নিশুতি রাতে ছুটতে ছুটতে সে কোথায় এসে পড়ে তার খেয়াল থাকে না। তার বাবার এক বন্ধুর ঘরে সে আশ্রয় নেয়। বন্ধুটি বিপত্নীক, বাবার বন্ধু বটে বাবা তো আর নয়, আর বন্ধুটির কাছে কালিন্দী একটি নারী। কুহকিনী নিশুতি রাতে চাঁদটাও চোখ বুজে রয়েছে, সুতরাং কেউই কিছু দেখবে না। তাই ক্ষুধার্ত বাঘ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে সে পালিয়ে যায়। ছুটতে ছুটতে কখন সে রূপনারায়নের তীরে সে জ্ঞানহারায় আর কখনই বা হারাধন তাকে কাছারীঘরে নিয়ে আসে তার খেয়াল নেই!

হরিহরের বাড়ির সামনে সেদিন যারা জড়ো হয়েছিলো তাদের মধ্যে সেই বন্ধুটি ছিলেন। এই জমায়েত থেকে যাযা শুনতে পাওয়া গেলে তার সারাংশ দাঁড়ায়, কালিন্দী পতিত - পল্লীর মেয়ে, হারাধনের সাথে কার বহুদিনের সম্পর্ক, মাঝেমাঝেই রাতে কাছারীঘরের দুজনকে দেখা যায়। হরিহর চাঙালী কালীর একনিষ্ঠ পূজারী হয়েও এইরকম একটি মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন। জনতার সামনে হারাধনের কোনো কাথাই টেকে নি। কেউ শোনেও নি। আর হরিহর পাথরের মূতি হয়েছিলেন।

সকলে চলে গেলে হরিহর কালিন্দীকে গৃহত্যাগ করার নির্দেশ দেন। এইভাবে তার বিশ্বাস কেউ কোনোদিন ভঙ্গ করেনি। আজ এই অপমান শুধুমাত্র এই মেয়েটির জন্য। মন্দিরের কালো মেয়েটিকে তিনি কি জবাব দেবেন? যে পাপকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন সেই ক্লেদ কিভাবে তিনি মুক্ত করবেন? আর হারাধন? তার নিজের ভাই? সে... সে... ছি: ছি: এই শিক্ষা দিয়েছেন তিনি ভাইকে? যে নিজের ঘরের দেখাশোনা করতে পারে না সে মন্দিরের মেয়েটির দেখাশোনা করবে কি করে?

হারাধন জানে জনমতের কতটা সত্য। যারা তার সাথে কালিন্দীকে প্রায় রাতে কাছারীতে দেখেন তারা কালিন্দীকে পতিতা খারাপ পাড়ার মেয়ে বলতেই পারেন! যারা সমাজকে পতিতা মেয়ের হাত থেকে বাঁচাতে বিধান দেন তারা পারেন না একটি অসহায় মেয়েকে সামাজের হাত থেকে বাঁচাতে। আর পতিতা? মেয়েদের পতিতা করে কে? যে সমাজ সকালের আলোতে কোনো নারীকে পতিতা অপবাদ দেয়, রাতের ঘোমটার আড়ালে সে-ই করে অবৈধ নিশিযাপন! তাছাড়া কালিন্দীকে ছেড়ে দেওয়া যায় নাকি? কোথায় যাবে সে। দাদা হরিহর তার কোনো কথাই কানে তোলেন না। এরপর সে যা করে তাতে স্তব্ধ হয়ে যায় সমাজ। চেণ্ডালী কালীর সামনে কালিন্দীকে সে বিবাহ করে। মাটি থেকে পেয়েছিলো বলে তার নাম রাখে মৃন্ময়ী।

পরেরদিন দেখা যায় সদরদরজার মাঝ বরাবর হরিহরের বাড়িতে পাঁচিল উঠেছে। সেইদিন থেকে দুইভাইয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

মতিলাল স্টেশন চত্বরে রিকশা চালায়। দিনে তার যা আয় হয় তাতে তিনজনের পেট চলে না। তার বই বিন্দু বাবুদের ক্ষেতে কাজ করে। মতিলাল রামগড়ের স্টেশন থেকে মাঝে মাঝে বুড়োশিবতলার মাঠ পেরিয়ে যাত্রী নিয়ে যায় প্রায় পাশের গ্রাম কৃশপত্রপুরের সীমানা পর্যন্ত। বুড়োশিবতলা মাঠে শিন্তের ফাইনাল হয় প্রতি বছর। খুব কড়াকড়ি খেলা সারা গ্রাম মুখিয়ে থাকে এই ফাইনালের দিকে। এই শিন্ত গ্রামের সম্মান, ফুটবল এই গ্রামের রক্তে রয়েছে।

দুপুরের দিকে স্টান্ডে তেমন ভিড় হয় না। বিকেলের দিকে ডাউনের দুটো ট্রেন থাকে। আর সন্ধ্যোর সময় একটা আপ ট্রেন। এই সময়টা বেশ কিছুটা ভিড় হয় স্টেশনে, যাত্রীর আনাগোনা বাড়ে।

দুপুরের সময় প্রবালের সঙ্গে গল্প করছিলো মতিলাল, পানের দোকানের প্রবাল তখনই পড়ার কটা ছেলে পুরোহিত ঠাকুরের ধরে রিক্সায় নিয়ে এলো। বৃন্দাবনদাসের বাড়িতে নারায়নের সিন্নী বিতরনের সময় পুরুতঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিলে তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করেন।

মোতিলাল পুরুত ঠাকুরকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এ তার পরম পূন্য। সেদিন থেকেই তো ওর আয় প্রায় দ্বিগুন হয়ে গেছে। চাঙালী কালিবাড়ির পুরোহিত বলে কথা। যে সে মানুষ তো নন! মোতিলাল আজকাল রোজ পুরুতঠাকুরের বাড়ির রাস্তা হয়ে আসে। যদি একবার দেখা পাওয়াযায় দেবতুল্য মানুষটার!

এই কদিন মৃন্ময়ীর বেশ ধকল যাচ্ছে। তবে এই পরিশ্রমটুকুর জন্য সে যেন অপেক্ষা করে থাকে। কখন দিদিদের বাজারটা বা দোকানটা করে সে নিঃসাড়ে রেখে আসবে যাতে হরিহর কোনোভাবে টের না পায়। হরিহরের শরীরটাযে সেদিন বৃন্দাবনদাসের বাড়িতে পুজো করতে গিয়ে বেশ কিছুটা বেয়াড়া ব্যবহার করেছে তা এখনো পুরোপুরি নিরাময় হয় নি। নিজের নৈপুন্যে সংসারের রান্নাবান্না বা হরিহরের জন্য পথ্য সব কিছু এসেছে পাঁচিলের অপর পার ডিঙিয়ে। সংসারের নিত্য কাজ, উঠোন নিকোনো, ফুল তোলা, গাছে জল দেওয়া - সুধারানীর সকল কাজ তখন মানন্দে মৃন্ময়ী ছাড়া আর কার?

হরিহর তখন কিছুটা সুস্থতার পথে। কড়া শাসন ও পথ্যের একঘেয়েমি ছাড়িয়ে একদিন মুখরোচক আহারে তিনি যারপর নাই খুশী হয়ে উঠলেন।

- তুমি তো সারাক্ষণই এখানে আছো। তবে এত সুন্দর রান্না করলে কে?

- পাশের বাড়ির রেখাই তো বাজার হাট, রান্না করে দিচ্ছে - সুধারানীর এই কথায় মেয়ে ঈশ্বরীও তার কাকিমাটির রক্ষার্থে সম্মত না হয়ে পারে নি।

রামগড়েররও বুক চিরে গেছে রূপনারায়ন। কালিবাড়ির রাস্তায় পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে রূপনারায়নের জল দেখা যায়। নদীটা এখানে খুব চওড়া নয়। ঘাটটাও খুব বড়ো

সৃষ্টিসন্ধান

নয়, নাম কাকশালিক চর। কাকশালিক চরে দুটো একটা নৌকা বাঁধা থাকে। তাতে পাখিদের খেলা চলে। এই শীতের সময় কুয়াশার স্তর ডিঙিয়ে সুর্যটার আড়মোড়া ভাঙতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। আজ বুধবার, হাটবার। কাকশালিক চলে সারি সারি বাঁধা ডিঙি, মাঝে কিছু বনতুলসীর ঝোপ ডিঙিয়ে হাটবসে, হাটের চত্বর পেরিয়ে জেলেরমাঠ, সেখানে মেলা হয় চৈত্রমাসে। তাতে যাত্রা হয়, শহরের নাম - করা সকল পালা!

এহাটে পুরুতবাড়ির ছোটবউকে প্রায় অনেকেই চেনে। শ্যামা রঙের মেয়েটার ব্যবহার বড় মিষ্টি। লোকে মেয়েটার নামে অনেক কুকথা বলে, মেয়েটা নাকি খারাপ পাড়ার ।তা সে হোক না কেন। তবে বড় সুন্দর কথা তার, আলুটা, সিমটা, পটলটা কিনতে সে মেয়ে বউগুলোর কুশন শুধোয়। বিন্তি পিসীর নাত্বউটা নতুন বিয়ের পর হাটে এসেছিলো আগের সপ্তাহে, ছোটবই আজকে তাকে এনে দিয়েছে নতুন সিদুঁর আর আল্তা।

আলুওলার ছেলের জ্বর পাঁচদিন হয়ে কমেনি। ছোট বই সেবার কালীবাড়ির ফুল আর চরনামৃত এনে দিয়েছিলো। ব্যাস্ জ্বরের আর দেখা নেই! এই গ্রামের দুঃখী মানুষগুলোর সুখদুঃখের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বাড়ির কাছের চেম্বারটা খুলে বসেছিলো বিলাস। সে এবারই নতুন বদলি হয়ে এসেছে রামগড়ে। বাইরে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাইনবোর্ডে রোদজলের অত্যাচারে বেশীরভাগ অক্ষরই অদৃশ্য! আজ বুধবার, চিকিৎসালয় বন্ধ। শনি রবিবারও বন্ধ থাকে। বিলাস ডাক্তারি পাস করেছে সবে সবে। তারপরেই এই পোস্টিং! এই গ্রামের মানুষগুলোকে খুব ভালো লাগে। ভালো লাগে আরেকজনকে!

এই সুন্দর সকালটার হিসেবনিকেশ সব বদলে দিয়ে মৃন্ময়ী ঢুকলো। বিলাস বেশ অবাক হয়েছে বোঝা যায়। এমন হওয়ার কথা ছিলো না, পুরুতবাড়ির ছোটবউকে ওষুধ বুঝিয়ে দিতে দিতে বার বার বিলাসের চোখ চলে যাচ্ছিল দরজার বাইরে। সেখানে যদি সে এসে অপেক্ষা করে।

গতকাল রাতে পুরুতবাড়িতে রোজকার মতো ঠাকুরকে একবার দেখে এসেছিলো বিলাস। এখন সে অনেক সুস্থ। গতকাল সে ওষুধ লিখে দিতে পারেনি। তাই আজকে বলেছিলো ঈশ্বরী যেন ওষুধ গুলো নিয়ে যায়। পুরুত ঠাকুরকে এই ক'দিন চিকিৎসা করতে করতে কতবার সে ঈশ্ববীর সুন্দর দুটো চোখের দিকে হ্যাংলার মতো সে চেয়েছে। এই সুন্দর মুখটা এমন তার শয়নে স্বপনে! দিব্যি মেয়ে তো ঈশ্বরী! সে এলো না।

ওষুধগুলো মৃন্ময়ীর হাতে তুলে দিতে দিতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলো বিলাস। শেষে যাওয়ার আগে ছোট বই বিলাসের চেম্বারের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল - ঈশ্বরীর কুয়োতলায় পা মচকে গেছে। নাহলে ওই আসতো, - এই বলে সে বেরিয়ে গেলো।

ঈশ্বরী পড়ে গেছে! আজ সারাক্ষণ তার মনটা ভালো থাকবে না।

খুব মনযোগ দিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিল সুবল। বার বার মেলাবার পরও হিসেব মিলছে না, মাথা চুলকে সে বেশ অসহায়ভাবেই বলে উঠলো - হিসেবে বাকি তেইশটাকার গরমিল হচ্ছে কেন বলতো, গুপী।

সুবলের ছোটভাই গুপী চাল মাপতে ব্যস্ত। হিসেবপত্র ওর মাথায় একেবারেই ঢোকে না। নিজের মনে কিভেবে নিয়ে সে বললো - ঠিক মনে পড়ছে না। একবার ফর্দটা দেখতে হবে।

-তোর কিছুই মনে থাকে না, এই করে গতবার পঞ্চাশ টাকা খোয়ালি। কতবার বলেছি লিখে রাখবি।

সুবলের দোকান অন্তপ্রান। তার ব্যবসাবুদ্ধি পাকা, তার দোকানে আজকাল সে প্লাস্টিকের খেলনা রাখে। পাড়ার ছেলেরা এতে মহাখুশী। মানুষকে খুশী রাখতে সুবলের খুব ভালো লাগে। তার মুদির দোকান এই চত্বরে সবচেয়ে জনপ্রিয়। কারন সুবলকে সকলে খুব ভালোবাসে।

তুষের চাদরটা কাঁধের ওপর জড়িয়ে নিয়ে হারাধন এগিয়ে আসতেই, কাগজটা এগিয়ে দিলো গুপী। মোটা রাস্তার ওপারে শিবুর চাঁয়ের দোকান। সুবলের দোকানের বাইরের বেঞ্চিতে বসে হারাধন কাগজের খবরে চোখ বোলাচ্ছিলো।

সুবল জিজ্ঞেসা করে - পুরুতটাকুরকে কাল কালীবাড়িতে দেখলান, এখন উনি কেমন আছেন গো?

- এখন ভালোই আছে দাদা।

- একবার গিয়ে প্রণাম করে আসবো। উনি সুস্থ হয়েছেন দেখলে আবার রামগড়ের ছিরি ফিরবে।

হাসে হারাধন।

- উনি অসুস্থ হলে কি মন ভালো থাকে? মনে মনে বলে সুবল, হারাধন, হেসে বলে - চলি রে।

পুতুল বুঝে ওঠে না ছোট মামা কেন তাকে বকে। তার ছোট্ট নতুন ভাইটিকে সেদিন সে কোলে নিয়েছিলো দেখে ছোটমা তাকে খুব বকাঝকা করেছিলো। চার বছরের পুতুলের চোখে জল এসে গিয়েছিলো। ছোট্ট ভাইটাকে পুতুল খুব ভালোবাসে। স্বপ্ন দেখে ভাইকে নিয়ে সে তার সঙ্গীদের সাথে খেলতে যাবে। বুড়ো অশ্বত্থগাছটার ডালের দোল নাটায় চড়বে দুজনে। আরো কত কি! বাবা পুতুলকে খুব ভালোবাসে। পুতুলের নিজের মা চলে যাওয়ার পর বাবা ছোটমাকে বাড়ি এনেছিলো, বলেছিলো ছোটমা তাকে খুব ভালোবাসবে, কিন্তু পুতুলকে ছোটমা এতো বকে কেন? সে চেষ্টা করে খুব ভালো হয়ে থাকতে। সে আরো ভালো হবে, ছোটমাকে একদিন তাকে ভালোবাসতেই হবে!

ঠাকুর বাবার শরীরটা ভালো রেখো। অসুখের পরে বাবার শরীরটা খুব ভেঙে গেছে। বাবাকে তাড়াতাড়ি ভালো করে তোলে। আমার কাকিমাটা খুব ভালো, তুমি তো জানো সে খারাপ মেয়ে নয়, সেই আগের মতো যেন আমরা সকলে একসাথে থাকতে পারি। চৈত্র মাসে আমরা একসাথে মেলায় চুড়ি কিনবো, যাত্রা দেখবো, হরিন খালির মাঠে জয়দেব মেলার সময় বায়স্কোপ দেখবো, কাকিমা কি সুন্দর সাজাতে জানে। দেখো ঠাকুর সব যেন আগের মতো হয়ে যায়। দেখো মা।... আর... আর ঐ যে বিলাস ডাক্তার, কেন মা ও র কথা আজ বারবার মনে পড়ছে! জানি না, দেখো ঠাকুর সব সব ভালো থাকুক। ওও থাকুক! - মনে মনে এই প্রার্থনা করে ঈশ্বরী কালীবাড়ির বটতলায় মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য কাপড় বাঁধলো, চাঙালী কালিকে প্রনাম করতেই পেছন থেকে এক পরিচিত কণ্ঠ বললো - পা ব্যাথা এখন কেমন আছে তোমার।

হাতে ডাক্তারি বাক্স নিয়ে বিলাস রোগী দেখে ফিরছিলো। মোটা ফ্রেমের চশ্মাটা নাকের কাছে নেমে এসেছে। হাওয়ায় মাথার চুল এলোমেলো।

লাজুক হেসে ঈশ্বরী বলে - এখন আর নেই।

আবার সেই ঈশ্বরীর দুচোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে কথা বলতে ভুলে যায় বিলাস। এরকম যে বারবার কেন হয়?

বিলাসের মুগ্ধতা দেখে মনে মনে হেসে ফেলে ঈশ্বরী।

আরক্ত মুখে বলে - আসি! বলে সে ছুট্টে চলে যায়

হরিহর ভালে ঈশ্বরীকে একদিন বিদায় দিতেই হবে। ঈশ্বরীর বিয়ে হলে এই বাড়িতে সে কিভাবে থাকবে? কে এগিয়ে এসে বাজার নিয়ে যাবে? কে বাতাসা জল এগিয়ে দেবে? মেয়েটা পর হয়ে গেলে ওরা দেখবে তো? বিয়ের তো প্রায় ঠিকই হয়ে গেলো এই রবিবার ঈশ্বরীকে দেখতে আসছে।

মৃন্ময়ীও তো কোনো বাড়ির মেয়ে। কোনো বাবা - মার স্নেহের সন্তান, তাদেরও আশা ছিলো তার মেয়ে সুখে থাকুক। কি পেল সে? পাড়াতে, বাজারে সকলেই মৃন্ময়ীর প্রশংসা করে, হরিহরের অসুস্থতার সময় সে একাহাতেই সংসার সামলিয়েছে সে আন্দাজ করতে পারে এখন! গিন্নীতো বলে মাঝেমাঝেই ছোট বউমা উপবাসী থাকে। মেয়েটার খুব দু:খ! একটু খোঁজ না নিয়েই মৃন্ময়ীকে দেওয়া অপবাদ বিশ্বাস করা বুঝি তার উচিত হয় নি!

খোকার বমি কিছুতেই কমছে না। দশবার হলো। কোনো ওষুধ কিছু করতে পারছে না। তার ওপর তিনদিনের জ্বর, মধুরা কেঁদে ভাসাছে, - ঠাকুর তুমি খোকাকে রক্ষা কোরো।

পুতুল ঘরে এসে বসে - ছোটমা, ভাইকে কালিবাড়ির চরনামৃত খাইয়ে দাও। দেখ ভালো হয়ে যাবে। আমি ঠাকুরকে বলেছি,

তুমুল বৃষ্টিতে একমাথা জল মেখে মেয়েটা ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে ছিলো। মধুরা চরনামৃত ছুঁয়ে দেয় খোকার ঠোঁটে।

পরদিন সকালে খোকা আবার হেসে উঠলো, সারা বাড়িতে আবার একরাশ আনন্দ! কিন্তু পুতুল কোথায়! মধুরা সারা বাড়িতে তাকে পাচ্ছে না। খিলেনের ধারে ভাঙা পাঁচিলে

সৃষ্টিসন্ধান

একা একা পুতুল বসে আছে দেখে মধুরা এগিয়ে যায়! মা - মরা মেয়েটাকে দেখে হঠাৎ খুব কষ্ট লাগে তার। নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে।

পুতুলের কাছে গিয়ে বলে - কি রে ভাইয়ের সাথে খেলবি না। দেখ তোর জন্য ভাই সেরে উঠেছে।

পুতুলের চোখে জল। মধুরার চোখও ভিজে যায়।

- তোকে আমি খুব কষ্ট দিই, না রে খুকি?

- না। ছোটমা, তুমি খুব ভালো।

- সত্যি বলছি? ঠিক আছে তবে একটা কথা রাখ!

- কি?

- ছোটমা না। আমাকে মা বলে ডাক!

পুতুল চুপ করে থাকে।

- কিরে । ডাকবি না?

- মা! বলে পুতুল কেঁদে ফেলে। মধুরা জড়িয়ে নিজেও কেঁদে ফেলে, বুঝতে পারে আজ আরেকবার মা হলো সে!

বিলাসের বাড়ি থেকে ঈশ্বরীকে দেখতে আসছে আজ! হরিহর খুব ব্যস্ত। বানির এপাশে হইচই। কিন্তু ওপাশে নিস্তব্ধতা, হরিহর একা মানুষ। তিনি একা কি পেরে ওঠেন! হারাধনটা একবার এগিয়ে আসতে পারতো না? বা ছোটবউমা!

দালানের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে হরিহর ডাক দেয় - হারু। হারু আছে - নাকি ছোটবই?

কতদিন বাদে ওপারের ডাক পাঁচিল ডিঙিয়ে ওপাশে পৌঁছলো।

- দাদা ডাকছো!

- তোরা একবারটি আয় তো রে!

মৃন্ময়ীকে নিয়ে হারাধন সদর পেরিয়ে বাড়িতে আসে।

হরিহর মৃন্ময়ীর কাছে এগিয়ে যায়

- বাড়িতে বিয়ে তোমাদের নিমন্ত্রন করতে হবে নাকি?

মাথা নিচু করে হাসিমুখে মৃন্ময়ী বলে - না দাদা ভুল হয়ে গেছে

সৃষ্টিসন্ধান